বঙ্গবন্ধুর ভাষা ও সাহিত্যচিন্তা

বিশ্বজিৎ ঘোষ*

[সারসংক্ষেপ : অপরিমেয় দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধ, রাজনৈতিক দূরদর্শিতা এবং নেতৃত্বের তুলনারহিত গুণাবলি পূর্ববাংলার শেখ মুজিবুর রহমানকে কেবল বঙ্গবন্ধু ও বাঙালি জাতির জনক পরিচয়ই এনে দেয়নি, অধিষ্ঠিত করেছে বিশ্বনেতৃত্বের আসনে। সীমাহীন অত্যাচার ও নিপীড়ন সহ্য করে বাঙালিকে একটি দেশ উপহার দেওয়া বঙ্গবন্ধু কেবল রাজনীতি-অর্থনীতি-সচেতন মানুষই ছিলেন না, ছিলেন আত্মসংস্কৃতি-সচেতন। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি রক্ষা ও চর্চার প্রতি তাঁর সতর্ক দৃষ্টি বিস্ময়ের উদ্রেক করে। সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশের সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালুকে বাধ্যতামূলক করা, বাংলাকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দেওয়ার প্রয়াস, অপরাপর ভাষার প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা প্রদর্শন, ব্যক্তিজীবনে সাহিত্যচর্চা ও বোধ এবং শিল্পী-সাহিত্যিকদের শিল্পচর্চাকে নিরন্তর উৎসাহিত করা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধুর ভিন্নমাত্রিক পরিচয় উন্মোচিত করা সম্ভব।]

বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০–১৯৭৫) বিশ্বব্যাপী একজন মুক্তিসংগ্রামী এবং মহান রাজনীতিবিদ হিসেবেই সমধিক পরিচিত। প্রকৃত প্রস্তাবেই তিনি রাজনীতির মানুষ– রাজনীতিই ছিল তাঁর জীবনের ধ্যান-জ্ঞান। তিনিই বাঙালির শ্রেষ্ঠতম জাতীয়তাবাদী নেতা। বাঙালির সম্মিলিত চেতনায় জাতীয়তাবোধ সঞ্চারে তিনি পালন করেছেন ঐতিহাসিক ভূমিকা। গণতান্ত্রিক মূল্যচেতনা এবং অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা– এই দ্বৈত বৈশিষ্ট্যই বঙ্গবন্ধুর জাতীয়তাবাদের মূলকথা। শোষণমুক্তির আকাঙ্ক্ষাই বঙ্গবন্ধুর জাতীয়তাবাদের মূল ভিত্তি। এই আকাঙ্ক্ষাকে তিনি সঞ্চারিত করে দিয়েছেন বাঙালির সামূহিক চেতনায়।

বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ, প্রকৃত অর্থেই, অভিন্ন ও একাত্ম। বাংলাদেশের কথা বলতে গিয়ে অনিবার্যভাবে এসে যায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম। জনগণের স্বার্থের সঙ্গে, দেশের স্বার্থের সঙ্গে নিজের স্বার্থকে তিনি একাত্ম করতে পেরেছেন। আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে বলতে হয় দেশের স্বার্থের কাছে, জনগণের স্বার্থের কাছে তিনি জলাঞ্জলি দিয়েছেন নিজের স্বার্থ। বিশ্ব-ইতিহাসে বঙ্গবন্ধুর মতো জাতীয়তাবাদী নেতার দৃষ্টান্ত বিরল। তিনিই একমাত্র নেতা যিনি জাতীয় পুঁজির আত্মবিকাশের আকাঙ্ক্ষা ও বাঙালির সম্মিলিত মুক্তির বাসনাকে মেলাতে পেরেছেন এক মোহনায়। বিশ্ব-ইতিহাসে কোনো জাতীয়তাবাদী নেতার কর্মসাধনায় এই যুগলস্রোতের মিলন লক্ষ করা যায় না।

শোষক ও শোষিতের সংগ্রামে বঙ্গবন্ধু শোষিত জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করতে পালন করেছেন ঐতিহাসিক ভূমিকা। সত্য ও ন্যায়ের পথ থেকে তিনি কখনো দূরে সরে যাননি, ভীতি ও অত্যাচারের মুখেও সর্বদা তিনি সত্যের কথা বলেছেন, বলেছেন শোষিত-বঞ্চিত মানুষের

* উপাচার্য, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ।

অধিকারের কথা। শোষিত মানুষের পক্ষে বঙ্গবন্ধুর এই অবস্থানের কারণে তিনি কেবল বাংলাদেশেরই নয়, বিশ্ব-মানুষেরই অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন। জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন, জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ– এসব সংস্থায় শোষিত মানুষের পক্ষে বঙ্গবন্ধুর অবস্থান বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হয়েছে– পেয়েছেন তিনি বিশ্ব-নেতার স্বীকৃতি।

রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান– উৎসর্গ করেছেন নিজের জীবন। তবে কেবল রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক মুক্তিই নয়, বাংলাদেশের ভাষা, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির মুক্তিসংগ্রামের অন্যতম নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধু পালন করেছেন ঐতিহাসিক ভূমিকা। বস্তুত, তাঁর সাধনার মধ্য দিয়েই ভাষা, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকেন্দ্রিক বাঙালি জাতীয়তাবাদের পূর্ণাঙ্গ ভিত্তি রচিত হয়েছে। ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন ভাষা, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রভিত্তিক জাতীয়তাবাদ। সন্দেহ নেই, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের চেতনা এক্ষেত্রে তরুণ শেখ মুজিবকে প্রভাবিত করেছে সবচেয়ে বেশি। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন তরুণ শেখ মুজিবুর রহমানের চিত্তলোকে সঞ্চার করেছে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা, সঞ্চার করেছে ভাষা ও সংস্কৃতির মুক্তির বাসনা। এ কারণেই ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রথম শাসনতন্ত্রে বাংলা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃত হলেও, বাংলা ভাষার সুষ্ঠু প্রয়োগের জন্য তাঁর সংগ্রাম চলেছে আমৃত্যু। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের অন্তর্গত চেতনায় সারাজীবন উদ্বুদ্ধ ও আলোকিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

বাংলাদেশ, বাঙালি জাতি, বাংলা ভাষা এবং বাংলা সাহিত্য– সবকিছুর প্রতিই ছিল বঙ্গবন্ধুর গভীর ভালোবাসা। বাংলার ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি নিয়ে বঙ্গবন্ধুর ভাবনার একটা নির্যাস পাওয়া যায় ১৯৭৪ সালের ১৮ই জানুয়ারি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের দ্বিবার্ষিক অধিবেশনে দেওয়া তাঁর অভিভাষণ থেকে। ওই অভিভাষণের নিম্নোক্ত অংশে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর ধারণার একটা সুস্পষ্ট রূপ প্রকাশিত হয়েছে :

> আমরা বাঙালি। আমরা জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করি। আমি যদি ভুলে যাই আমি বাঙালি, সেদিন আমি শেষ হয়ে যাব। আমি বাঙালি, বাংলা আমার ভাষা, বাংলা আমার দেশ, বাংলার মাটি আমার প্রাণের মাটি, বাংলার মাটিতে আমি মরব, বাংলার কৃষ্টি, বাংলার সভ্যতা আমার কৃষ্টি ও সভ্যতা। (দ্রষ্টব্য : মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর, ২০১২ : ১১৪)

বাংলা ভাষার উন্নতি ও বিকাশের জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাবনা ও চিন্তা বিভিন্ন ভাষণ থেকে আমরা জানতে পারি। কীভাবে ভাষা ও সাহিত্যকে উন্নত করা যায় তা নিয়ে সবসময় তিনি ভাবতেন, এ বিষয়ে সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের নিয়ত প্রেরণা দিতেন– তাঁদের নির্ভয়ে কাজ করার সাহস জোগাতেন (আতিউর রহমান : ১৩)। কখনো-কখনো ভাষা ও সাহিত্য প্রসঙ্গে একজন ভাষাতাত্ত্বিকের মতোই বঙ্গবন্ধু উচ্চারণ করেছেন তাঁর ভাবনা। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায় ১৯৭১ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমি আয়োজিত রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের স্মরণ সপ্তাহের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ। ওই ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেছেন :

> মুক্ত পরিবেশেই ভাষার বিকাশ হয়। ঘরে বসে ভাষার পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা যায় না। এর পরিবর্তন-পরিবর্ধন হয় ব্যবহারের ভিতর দিয়ে। ভাষার গতি নদীর স্রোতধারার মতো। ভাষা নিজেই তার গতিপথ রচনা করে নেয়। কেউ এর গতি রোধ করতে পারে না। এই মুক্ত পরিবেশে বুদ্ধিজীবীরা নিজেদের অতীত ভূমিকা ভুলে স্বাজাত্যবোধে উদ্দীপ্ত হয়ে বাংলা ভাষাকে গণমুখী ভাষা হিসেবে গড়ে তুলুন। জনগণের জন্যেই সাহিত্য। এ দেশের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে

> নিজেদের লেখনীর মধ্যে নির্ভয়ে এগিয়ে আসুন, দুঃখী মানুষের সংগ্রাম নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করুন। কেউ আপনাদের বাধা দিতে সাহস করবে না। (*দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৩.০২.১৯৭১)

—উদ্ধৃত অংশ থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য বঙ্গবন্ধুর আত্যন্তিক আকাঙ্ক্ষার কথা সম্যক উপলব্ধি করা যায়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সবসময় কল্পনা করেছেন স্বাধীন ও মুক্ত সংস্কৃতির। ব্রিটিশ এবং পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক আমলে সংস্কৃতিকে অবরুদ্ধ তথা ধ্বংস করার জন্য বৈদেশিক প্রশাসন নানারকম কালাকানুন চালু করে, বৃহত্তর লোকায়ত সংস্কৃতির পরিবর্তে তারা চালু করে মেকি সংস্কৃতি। ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির মূল লক্ষ্যই ছিল বৃহত্তর জনসংস্কৃতি থেকে মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া। কেননা, জনসংস্কৃতি মানুষকে জাগ্রত করে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাকে দ্রোহী করে তোলে, তার চিত্তে সঞ্চার করে মুক্তির বাসনা। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি বাঙালির জনসংস্কৃতির বিরুদ্ধে ছিল, ছিল পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শক্তিও। এ সূত্রেই জনসংস্কৃতির মুক্তিদাতা হিসেবে স্মরণ করতে হয় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কথা। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন দ্বারা প্রাণিত হয়ে উত্তরকালে শেখ মুজিবুর রহমান সংস্কৃতির মুক্তির জন্য নানামাত্রিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। প্রসঙ্গত মঞ্চনাটকের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। শতাব্দী-প্রাচীন ঔপনিবেশিক সংস্কৃতি-নীতির পরিবর্তন করলেন বঙ্গবন্ধু— প্রাচীন অভিনয়-আইন পরিবর্তন করে নতুন আদেশ তিনি জারি করেন ১৯৭৫ সালের জুন মাসে— খুলে গেল সংস্কৃতি জগতের একটা বদ্ধ অর্গল। ১৯৭৫ সালে জারিকৃত রাষ্ট্রপতির আদেশের দুটো ধারা উল্লেখ করলেই বোঝা যাবে সংস্কৃতির মুক্তি তথা বিকাশের জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক অবদানের কথা :

> ক. দেশে জাতীয় সংস্কৃতির সুষ্ঠু বিকাশের উদ্দেশ্যে মহামান্য রাষ্ট্রপতি শৌখিন নাট্যগোষ্ঠী কর্তৃক নাট্যাভিনয়ের উপর থেকে প্রমোদকর রহিত করার নির্দেশ দিয়েছে। তদনুসারে অর্থ মন্ত্রণালয় ১৯২২ সালের The Bengal Amusement Tax Act 1922 (Bengal Act V of 1922) সংশোধন করেছেন।
>
> খ. অভিনয়ে অনুমতি দেবার পূর্বে নাটকের পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা করে দেখার বিধি বর্তমানে প্রচলিত রয়েছে। তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয় অহেতুক হয়রানি এড়াবার জন্যে এই পরীক্ষা প্রণালী সহজ করার উদ্দেশ্যে সংস্কৃতি ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সহিত পরামর্শক্রমে ১৮৭৬ সালের Act No. 29 of 1876 (16th December 1876) 'An Act for the better control of dramatic performances' আইনের সংশোধনের ব্যবস্থা করবেন। (দ্রষ্টব্য : বিশ্বজিৎ ঘোষ, ২০০৯ : ১৫২)

—বঙ্গবন্ধুর এই আদেশের মৌল অনুপ্রাণনা হিসেবে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের চেতনাকে অনায়াসেই শনাক্ত করা যায়।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি বঙ্গবন্ধুর ভালোবাসা ও অনুরাগের কথা তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতা ও অভিভাষণ থেকে সম্যক অবহিত হওয়া যায়। ১৯৪৮-উত্তরকালে অনেক ভাষণেই তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের কথা বলতেন, রবীন্দ্রনাথ-নজরুলের সাহিত্যের নানা উদ্ধৃতির ব্যবহার করতেন। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য তিনি কারারুদ্ধ, এমনকি বুলেটের আঘাতে মৃত্যুবরণের কথাও বলেছেন। ১৯৫৩ সালে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের অনন্য তারিখ ২১শে ফেব্রুয়ারি শহিদ দিবস পালন উপলক্ষ্যে ঢাকার আরমানিটোলা ময়দানে যে ভাষণ দেন শেখ মুজিবুর রহমান, তাতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগের কথা ব্যক্ত হয়েছে। ওই ভাষণে তিনি বলেন :

> Nazimuddin and Nurul Amin Govts are not prone to the just demands of the people in general. People demanded Bengali to be one of the state languages of Pakistan but they have turned a deaf ear to it. Khawaja Nazim declared that Urdu should be the only state language of Pakistan. The movement punched on the 21st Feb. 1952 was not a movement for the Bengali Language– it was a movement for our life and death. We want to live like men– want food, cloth, shelter, rights of a citizen, liberty of speech and a society free from exploitation. The movement of 21st Feb. 1952 was an expression of these demands of the people, and the students received bullets and Lathicharge. We have come here to observe 'martyrs day' but every day people are dying of starvation in East Bengal. Our mothers and sisters are going naked, morale of people of East Bengal has broken and the ruling class is sucking the blood of the people. I am not disrespectful to those who died in connection with Language Movement. Demands of no nation can be met without sacrifice and perseverance. We have to end the present oppressive rule in the country by peaceful means and establish a people's rule in its place. Bengali is one of the richest languages of the world. Each one of the East Bengali is ready to lay down life for the demand for Bengali Language. Moulana Bhasani and a few hundred others are in jail. No one can be detained in jail without a trial. We cannot get our demands fulfilled by merely passing resolutions. There cannot be any truce or pact with the oppressors who have sucked our blood and kept our mothers and sisters naked. Either they or we will remain in power. Every one of us wants not only Bengali as one of the State Languages, food, cloth, shelter but also the rights of a citizen, liberty of speech and release of political prisoners. If the present Govt. cannot concede to these just demands of the people let them give out power for those who will be able to fulfill them. So long as our demands are not conceded we shall carry on our movement peacefully in every nook and corner of East Bengal. Muslim League rule must be brought to an end by peaceful means for the good of the people in general. We are ready not only to go to jail but also to face bullets for the demands of Bengali Language, release of political prisoners and for making a society free from exploitation. [Sheikh Hasina, 2009B : 88]

—আরমানিটোলা ময়দানে শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণের এই সংক্ষিপ্ত ইংরেজি ভাষ্য থেকে সহজেই অনুধাবন করা যায় রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের চেতনা তাঁকে কীভাবে সন্দীপিত করে তুলেছে। ভাষার সঙ্গে তিনি বাঙালির বাঁচা-মরার প্রসঙ্গটি উপলব্ধি করেছেন, বাংলা ভাষা আর বাঙালির অস্তিত্বকে তিনি গ্রথিত করেছেন অভিন্ন সূত্রে।

অসমাপ্ত আত্মজীবনী, *কারাগারের রোজনামচা* এবং *আমার দেখা নয়াচীন* গ্রন্থত্রয়ের বিভিন্ন স্থানে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন এবং বাংলা ভাষা সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রাতিস্বিক ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। সকল মানুষই মাতৃভাষাকে ভালোবাসে। প্রসঙ্গত এক জায়গায় তিনি লিখেছেন : 'যে কোনো জাতি তার মাতৃভাষাকে ভালবাসে। মাতৃভাষার অপমান কোনো জাতিই কোনো কালে সহ্য করে নাই' (শেখ মুজিবুর রহমান, ২০১২ : ৯৯)। এখানে একটা কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। বাংলা ভাষার প্রতি গভীর ভালোবাসা তাঁর মধ্যে কোনো সংকীর্ণ ভাষাচিন্তার জন্ম দিতে পারেনি। উদার দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে তিনি সকল ভাষার প্রতিই তাঁর গভীর ভালোবাসার কথা ব্যক্ত করেছেন। পাকিস্তানের বৃহত্তর

বাস্তবতায় বাংলার পাশাপাশি উর্দুসহ অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষাকে স্বীকৃতির পক্ষে তিনি সুস্পষ্ট মত দিয়েছেন (আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, ২০১৮ : ১১)। অথচ বাংলা ভাষার প্রতি পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধ আচরণ ও নানা ষড়যন্ত্রের কারণে উর্দুসহ পশ্চিম পাকিস্তানে প্রচলিত ভাষাসমূহের বিরুদ্ধাচরণ করতে পারতেন তিনি। এ বিষয়ে *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*তে তিনি ব্যক্ত করেছেন সুস্পষ্ট অভিমত :

> বাংলা পাকিস্তানের শতকরা ছাপ্পান্ন ভাগ লোকের মাতৃভাষা। তাই বাংলাই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত। তবুও আমরা বাংলা ও উর্দু দুইটা রাষ্ট্রভাষা করার দাবি করেছিলাম। পাঞ্জাবের লোকেরা পাঞ্জাবি ভাষা বলে, সিন্ধুর লোকেরা পশতু ভাষায় কথা বলে, বেলুচরা বেলুচি ভাষায় কথা বলে। উর্দু পাকিস্তানের কোনো প্রদেশের ভাষা নয়, তবুও যদি পশ্চিম পাকিস্তানের ভায়েরা উর্দু ভাষার জন্য দাবি করে, আমরা আপত্তি করব কেন? (শেখ মুজিবুর রহমান, ২০১২ : ৯৮)

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলা ভাষায় বক্তৃতা করতে ভালোবাসতেন– বাংলা ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও ভালোবাসা থেকেই তিনি বাংলায় বক্তৃতা করতেন। ১৯৫২ সালের অক্টোবর মাসে, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের আট মাস পরে, বেইজিং-এ আয়োজিত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলোর প্রতিনিধিদের শান্তি সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু অংশগ্রহণ করেন। সেই শান্তি সম্মেলনে পাকিস্তানের প্রতিনিধি দলের সদস্য শেখ মুজিবুর রহমান বাংলা ভাষায় বক্তৃতা করেন, যা ইংরেজি, চীনা, রুশ ও স্পেনিশ ভাষায় অনুবাদ করে উপস্থিত প্রতিনিধিবর্গকে শোনানো হয়। এ প্রসঙ্গে *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*তে শেখ মুজিবুর রহমান লিখেছেন : 'পূর্ব পাকিস্তান থেকে আতাউর রহমান খান ও আমি বক্তৃতা করলাম। আমি বাংলায় বক্তৃতা করলাম। আতাউর রহমান সাহেব ইংরেজি করে দিলেন। ... কেন বাংলায় বক্তৃতা করব না! ভারত থেকে মনোজ বসু বাংলায় বক্তৃতা করেছেন। পূর্ব বাংলার ছাত্ররা জীবন দিয়েছে মাতৃভাষার জন্য। বাংলা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু লোকের ভাষা। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে না জানে এমন শিক্ষিত লোক চীন কেন দুনিয়ার অন্যান্য দেশেও আমি খুব কম দেখেছি। আমি ইংরেজিতে বক্তৃতা করতে পারি। তবু আমার মাতৃভাষায় বলা কর্তব্য' (শেখ মুজিবুর রহমান, ২০১২ : ২২৮)। এ প্রসঙ্গে *আমার দেখা নয়াচীন* গ্রন্থে শেখ মুজিবুর রহমান অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। মাতৃভাষাকে উপেক্ষা করে যে বড়ো হওয়া যায় না, সে-কথা তিনি এখানে যুক্তি দিয়ে উপস্থাপন করেছেন। শান্তি সম্মেলনের অভিজ্ঞতার আলোকে মাতৃভাষা প্রসঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমান যা বলেছেন, সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের অবিনাশী চেতনা যে তাঁর মনোলোকে ক্রিয়াশীল ছিল, তা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। মাতৃভাষা প্রসঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমান লিখেছেন :

> ... আমি বক্তৃতা করলাম বাংলা ভাষায়, আর ভারত থেকে বক্তৃতা করলেন মনোজ বসু বাংলা ভাষায়।
>
> বাংলা আমার মাতৃভাষা। মাতৃভাষায় বক্তৃতা করাই উচিত। কারণ পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলনের কথা দুনিয়ার সকল দেশের লোকই কিছু কিছু জানে। মানিক ভাই, আতাউর রাহমান খান ও ইলিয়াস বক্তৃতাটা ঠিক করে দিয়েছিল। দুনিয়ার সকল দেশের লোকই যার যার মাতৃভাষায় বক্তৃতা করে। শুধু আমরাই ইংরেজি ভাষায় বক্তৃতা করে নিজেদের গর্বিত মনে করি। (শেখ মুজিবুর রহমান, ২০২০ : ৪৩)

অনেকের মাঝেই দেখা যায় যে, মাতৃভাষাকে উপেক্ষা করে অন্য ভাষায় কথা বলতে তারা অহংকার বোধ করে। বাংলাদেশে এই প্রবণতা ভয়াবহভাবে বিরাজমান। এখানে অনেকেই ভুল

ইংরেজিতে কথা বলবে, ক্লাসেও ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা দেখানোর আপ্রাণ চেষ্টা করবে– তবু মাতৃভাষা বাংলায় কথা বলবে না। ইংরেজিতে ভুল করলে তারা লজ্জিত হয়, কিন্তু বাংলায় ভুল করলে তারা লজ্জা পায় না, বরং বলে– বাংলা ভাষা এখন আর আসে না। এখানেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আমাদের স্মরণ করতে হয়। *আমার দেখা নয়াচীন* গ্রন্থে লেখা শেখ মুজিবুর রহমানের বক্তব্য এ প্রসঙ্গে সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য :

> ... দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ ভাষার অন্যতম ভাষা বাংলা। আমি দেখেছি ম্যাডাম সান ইয়াৎ-সেন খুব ভালো ইংরেজি জানেন, কিন্তু তিনি বক্তৃতা করলেন চীনা ভাষায়। একটা ইংরেজি অক্ষরও তিনি ব্যবহার করেন নাই।
>
> চীনে অনেক লোকের সাথে আমার আলাপ হয়েছে, অনেকেই ইংরেজি জানেন, কিন্তু ইংরেজিতে কথা বলবেন না। দোভাষীর মাধ্যমে কথা বলবেন। আমরা নানকিং বিশ্ববিদ্যালয় দেখতে যাই। সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ইংরেজি জানেন, কিন্তু আমাদের অভ্যর্থনা করলেন চীনা ভাষায়। দোভাষী আমাদের বুঝাইয়া দিলো। দেখলাম তিনি মাঝে মাঝে এবং আস্তে আস্তে তাকে ঠিক করে দিচ্ছেন যেখানে ইংরেজি ভুল হচ্ছে। একেই বলে জাতীয়তাবোধ। একেই বলে দেশের ও মাতৃভাষার উপরে দরদ। (শেখ মুজিবুর রহমান, ২০২০ : ৪৪)

কেবল বক্তৃতা-বিবৃতি-ভাষণেই নয়, আইনসভাতেও বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠার পক্ষে শেখ মুজিবুর রহমান পালন করেছেন সাহসী ভূমিকা। ১৯৫৩ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের গণপরিষদে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানানো ছাড়াও তিনি বাংলা ভাষায় বক্তৃতা দেওয়ার সুযোগ চান। স্পিকার ওহাব খান পশতু ভাষার স্বীকৃতি না-থাকা সত্ত্বেও একজন সদস্যকে ওই ভাষায় বক্তৃতা দেওয়ার সুযোগদানের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে শেখ মুজিব বাংলা ভাষায় বক্তৃতা দেওয়ার সুযোগ চান। কিন্তু তাঁকে বাংলা ভাষায় বক্তৃতা দেওয়ার সুযোগ না-দেওয়ায় শেখ মুজিবুর রহমান বিক্ষুব্ধ হয়ে প্রতিবাদ জানান, অন্যান্য সদস্য নিয়ে ওয়াকআউটের হুমকি দেন। স্পিকারকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন :

> … I would request you to revise your ruling and allow honorable members to speak in Bengali which is going to be one of the State Language of Pakistan. It is a very serious matter for us and here nobody can force us not to speak in our own mother-tongue. I will here and now speak in Bengali and nobody can prevent me from doing that. If you are not going to allow me to speak in Bengali, then all the Awami League members will have no alternative but to walk out of the House, as a protest. (উদ্ধৃত : Shahryar Iqbal, 1977 : 28)

—অভিন্ন দিনে গণপরিষদে তিনি বলেন : 'আমরা ইংরেজি বলতে পারবো, তবে বাংলাতেই আমরা বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি। যদি পরিষদে আমাদের বাংলায় বক্তৃতার সুযোগ না দেওয়া হয় তবে আমরা পরিষদ বয়কট করবো। ... বাংলাকে অবশ্যই প্রতিষ্ঠা করবো' (উদ্ধৃত : Shahryar Iqbal, 1977 : 28)

পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শক্তি বাংলা ভাষাকে ধ্বংস করার জন্য বহুমাত্রিক ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে বাংলা লিপির পরিবর্তে আরবি হরফে বাংলা লেখার প্রস্তাব করে। এক রাষ্ট্র এক ভাষা স্লোগান উত্থাপন করে বাঙালি সংস্কৃতি ধ্বংসের পাঁয়তারা করতে থাকে পাকিস্তানি শাসকেরা। বর্ণমালা পরিবর্তনের সরকারি এই প্রস্তাবকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। পাকিস্তানি ষড়যন্ত্রের বিরোধিতা করে শেখ মুজিবুর রহমান যৌক্তিকভাবে বলেন এই কথা : 'কে না জানে যে, সমগ্র ইউরোপই রোমান হরফ ব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু একই

হরফের ব্যবহার ইউরোপীয় সংহতির জন্য সহায়ক হয় নাই। মধ্যপ্রাচ্যে ১১টি দেশে আরবি হরফ প্রচলিত রহিয়াছে কিন্তু একই হরফ সত্ত্বেও আরব বিশ্বে কোন একতা নাই' (*দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৫.০৫.১৯৬৪)। ঔপনিবেশিক পাকিস্তানি সরকার যে বলেছিল পাকিস্তানের পূর্ব ও পশ্চিম অংশে একই হরফ বা ভাষা ব্যবহার রাষ্ট্রীয় সংহতি সুদৃঢ় করবে– তার বিরুদ্ধে ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এই দাঁতভাঙা জবাব। *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*তে এ প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান লিখেছেন :

> ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারির কথা কেউই ভুলে নাই। আমরা তাড়াতাড়ি শাসনতন্ত্র করতে জনমত সৃষ্টি করতে লাগলাম। পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের দাবি মেনে নেওয়া ছাড়া এবং বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা না মেনে নিলে আমরা কোনো শাসনতন্ত্র মানব না। এসময় ফজলুর রহমান সাহেব আরবি হরফে বাংলা লেখা পদ্ধতি চালু করতে চেষ্টা করছিলেন। আমরা এর বিরুদ্ধেও জনমত সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলাম। (শেখ মুজিবুর রহমান, ২০১২ : ২৪৩)

বাংলা ভাষা আর বাংলাদেশকে শেখ মুজিবুর রহমান নিজের প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসতেন। পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা দেওয়ার সংগ্রামে তিনি ছিলেন অগ্রসেনানী। ১৯৫৫ সালে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ববাংলার নাম পরিবর্তন করে পূর্ব পাকিস্তান করার প্রস্তাব উত্থাপন করে। সঙ্গে-সঙ্গে ভয়ানক ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন শেখ মুজিবুর রহমান। গণপরিষদের অধিবেশনে দাঁড়িয়ে পূর্ববাংলার নাম পরিবর্তনের তীব্র বিরোধিতা করেন তিনি। ১৯৫৫ সালের ২৫শে আগস্ট গণপরিষদে ভাষণদানকালে তিনি বলেন :

> ওরা [পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার] 'পূর্ব বাংলা' নামের পরিবর্তে 'পূর্ব পাকিস্তান' নাম রাখতে চায়। আমরা বহুবার দাবি জানিয়েছি যে, আপনারা উহাকে 'বাংলা' নামে ডাকেন। 'বাংলা' শব্দটির একটা নিজস্ব ইতিহাস আছে, আছে এর একটা ঐতিহ্য। আপনারা এই নাম আমাদের জনগণের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে পরিবর্তন করতে পারেন। আপনারা যদি এই নাম পরিবর্তন করতে চান তাহলে আমাদের বাংলায় যেতে হবে এবং সেখানকার জনগণের কাছে জিজ্ঞেস করতে হবে– তারা নাম পরিবর্তনকে মেনে নেবে কি না' (উদ্ধৃত : মুনতাসীর মামুন, ২০১২ : ১৭১)।

প্রসঙ্গত শেখ মুজিবুর রহমানের অন্য একটি ভাষণের কথাও আমরা স্মরণ করব। ১৯৬৯ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিক উপলক্ষ্যে আওয়ামী লীগ আয়োজিত এক আলোচনা সভায় পূর্ব পাকিস্তানকে তিনি 'বাংলাদেশ' নামে অভিহিত করেন এবং সকলকে 'বাংলাদেশ' লিখতে ও বলতে আহ্বান জানান। ওই আলোচনা সভায় তিনি ঘোষণা করেন :

> একসময় এদেশের বুক হইতে মানচিত্রের পৃষ্ঠা হইতে 'বাংলা' কথাটির সর্বশেষ চিহ্নটুকুও চিরতরে মুছিয়া ফেলার চেষ্ট করা হইয়াছে। ... একমাত্র 'বঙ্গোপসাগর' ছাড়া আর কোন কিছুর নামের সঙ্গে 'বাংলা' কথাটির অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। ... জনগণের পক্ষ হইতে আমি ঘোষণা করিতেছি– আজ হইতে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশটির নাম 'পূর্ব পাকিস্তান'-এর পরিবর্তে শুধুমাত্র 'বাংলাদেশ'। (শেখ মুজিবুর রহমান, ২০১২ : ২৯৭)

১৯৫২ সালে বৈইজিং-এ আয়োজিত শান্তি সম্মেলনে বাংলা ভাষায় শেখ মুজিবুর রহমান যে বক্তৃতা দেন, তার ধারাবাহিকতা উত্তরকালেও তাঁর মাঝে লক্ষ করা গেছে। ১৯৫৫ সালের ৯ই নভেম্বর স্পিকারের নির্দেশ উপেক্ষা করে শেখ মুজিবুর রহমান বাংলা ভাষায় বক্তৃতা করেন। বাংলা ভাষার সাংবিধানিক স্বীকৃতি, ২১শে ফেব্রুয়ারিকে সরকারিভাবে শহিদ দিবস এবং সরকারি ছুটি ঘোষণার জন্য শেখ মুজিবুর রহমান গণপরিষদের ভাষণ-অভিভাষণে সর্বদা সোচ্চার ছিলেন। এ প্রসঙ্গে *কারাগারের রোজনামচায়* তিনি লিখেছেন : "এইদিন [২১শে ফেব্রুয়ারি] আমাদের কাছে পবিত্র

দিন। ১৯৫৫ সালে নূতন কেন্দ্রীয় আইনসভায় আওয়ামী লীগ ১২জন সদস্য নিয়ে ঢুকল এবং তাদের সংগ্রামের ফলে পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারা বাধ্য হলো ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রে বাংলা ও উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করতে। আওয়ামী লীগ যখন ১৯৫৬ সালে ক্ষমতায় বসল তখন ২১শে ফেব্রুয়ারিকে 'শহীদ দিবস' ও সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা করল" (শেখ মুজিবুর রহমান, ২০১৭ : ২০৭)। ১৯৭৪ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ২৯তম অধিবেশনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলা ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে বিশ্ববাসীকে অবাক করে দেন। এই ঘটনা বাংলা ভাষার বিশ্বায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বাংলা ভাষার আন্তর্জাতিকীকরণে বঙ্গবন্ধুর এই দুঃসাহসী ভূমিকা সম্পর্কে অনেকেই সদর্থক মূল্যায়ন করেছেন। এমন পাঁচটি মূল্যায়ন এখানে উৎকলিত হলো :

ক. শেখ হাসিনা

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা ভাষার সাহিত্যের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করিয়া বাংলা ভাষাকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন, আর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পর জাতিসংঘে বাংলায় ভাষণ দিয়া বাংলা ভাষা ও বাঙালি জাতিকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। (উদ্ধৃত : এম. আর মাহবুব, ২০১৩ : ১৫৫)

খ. তোফায়েল আহমেদ

বঙ্গবন্ধুকে প্রথমেই অনুরোধ করা হয়েছিল, 'মানীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনি ইংরেজিতে বক্তৃতা করবেন।' ... কিন্তু প্রিয় মাতৃভাষার প্রতি সুগভীর দরদ ও মমত্ববোধ থেকে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন 'আমি মাতৃভাষা বাংলায় বক্তৃতা করতে চাই।' সিদ্ধান্তটি তিনি আগেই নিয়েছিলেন ... মাতৃভাষা বাংলায় বক্তৃতা দেওয়ার বঙ্গবন্ধুর এই সিদ্ধান্ত ছিল তাঁর সমগ্র জীবনের স্বাভাবিক এবং যৌক্তিক পরিণতি। সেদিন বক্তৃতারত বঙ্গবন্ধুর দিকে তাকিয়ে কেবলই মনে হয়েছে, তিনি যেন বহুযুগ ধরে এমন দিনের অপেক্ষায় নিজেকে প্রস্তুত করেছিলেন। মাতৃভাষায় বঙ্গবন্ধু মুজিবের এই ঐতিহাসিক বক্তৃতার পর অধিবেশনে সমাগত পাঁচটি মহাদেশের প্রতিনিধি এবং সমগ্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বহুল পঠিত জাতিসংঘের ডেলিগেট বুলেটিন বঙ্গবন্ধুকে 'কিংবদন্তির নায়ক মুজিব' বলে আখ্যায়িত করে। (তোফায়েল আহমেদ, ২০১২)

গ. জিল্লুর রহমান

১৯১৩ সালে সাহিত্যে নোবেল বিজয়ী হয়ে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা সাহিত্যকে সারা বিশ্বে গৌরবের আসনে অলংকৃত করেছিলেন। ১৯৭৪ সালের সেপ্টেম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে বাংলা ভাষায় প্রথম ভাষণ প্রদান করে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলা ভাষাকে মর্যাদাপূর্ণ ও আন্তর্জাতিকীকরণেও ঐতিহাসিক ধারার সূচনা করেছিলেন। (উদ্ধৃত : এম আর মাহবুব, ২০১৩ : ১৫৩-১৫৪)

ঘ. আবদুল গাফফার চৌধুরী

রবীন্দ্রনাথ যেমন সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়ে বাঙালির আন্তর্জাতিক কালচারাল নেশনহুডের ভিত্তি তৈরির সূচনা করেছেন, শেখ মুজিবুর রহমান তেমনি জাতিসংঘে বাংলা ভাষায় ভাষণ দিয়ে সেই ন্যাশনহুডের রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক মর্যাদার স্বীকৃতি আদায় করেছেন। (উদ্ধৃত : এম আর মাহবুব, ২০১৩ : ১৫৪)

ঙ. সন্তোষ গুপ্ত

একদা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করে বাঙালি জাতিকে বিশ্বের দরবারে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। তারপর যুগান্তরের রথচক্র কতবার আমাদের ইতিহাসের

> ওপর দিয়ে গড়িয়ে গেছে। ... তারপর দেখা গেল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দ্বিতীয় বারের মত বাংলা ভাষাকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরলেন। জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাংলা ভাষায় ভাষণ দেন। ... এই প্রথম একটি সদস্য রাষ্ট্রের পক্ষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব জাতিসংঘে বাংলা ভাষায় ভাষণ দেন। এখানেও তিনি এক অনন্য ইতিহাস সেদিন সৃষ্টি করেছিলেন। আমাদের সংকীর্ণ-চিত্ত কিছু রাজনীতিক সম্ভবতঃ মুষ্টিমেয় উন্নাসিক পতিত ব্যক্তি বাংলা ভাষাকে শেখ মুজিবের এই মর্যাদাদানের বিষয়টি উপেক্ষা করেছেন। আমরাও কার্যত এর তাৎপর্য স্পষ্ট বুঝতে পারিনি কিংবা সেরূপ গৌরব অনুভব করিনি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ জাতীয় কংগ্রেসের পাবনা অধিবেশনে বাংলায় অভিভাষণ দেওয়ার ব্যাপারে জাতীয় নেতাদের সম্মত করাতে পারেননি। ইংরেজিতে ভাষণ দেয়ায় তারা গৌরব অনুভব করতেন। প্রভুর ভাষায় অধিকার লাভের জন্য আবেদন-নিবেদন করতেই তারা ভালবাসতেন। ... বঙ্গবন্ধু জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বাংলা ভাষায় ভাষণ দিয়ে আমাদের ভাষার মর্যাদাকে বিশ্ব রাষ্ট্র সভায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। দুর্ভাগ্য আমাদের এবং আমাদের লজ্জা এখানেই যে, আমরা সেদিন এর গভীর তাৎপর্য অনুধাবন করতে চাইনি। (সন্তোষ গুপ্ত, ২০০০)

১৯৭০ সালের ঐতিহাসিক নির্বাচনের প্রাক্কালে বাঙালির আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রশ্নে বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার উপর বঙ্গবন্ধু বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। বাংলা ভাষার প্রতিষ্ঠার জন্য, ১৯৫২ সালের মতো, যে-কোনো ধরনের ত্যাগ স্বীকারের জন্য বাঙালিকে তিনি আহ্বান জানান। ১৯৬৯ সালের ১লা আগস্ট পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের খসড়া গঠনতন্ত্র প্রকাশ উপলক্ষ্যে প্রদত্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষা-ভাবনার সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে। ওই ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন :

> পাকিস্তানের সর্ব অঞ্চলে মাতৃভাষাকে সর্ব্বোচ্চ শিক্ষার মাধ্যমরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। পূর্ব পাকিস্তানে শিক্ষার সর্বস্তরে বাংলা ভাষাকে যত শীঘ্র সম্ভব শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে প্রচলন করিতে হইবে এবং পাকিস্তানেও সরকারী ও বেসরকারী সকল প্রতিষ্ঠানের এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ও ব্যবসায়িক জীবনে বাংলা ভাষার ব্যাপক প্রসারের চেষ্টা করিতে হইবে। বাংলা ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও শিল্পকলার উন্নতি ও বিকাশের জন্য কার্যকরী উৎসাহ প্রদান করিতে হইবে এবং সকল প্রকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। (উদ্ধৃত : আবুল কাসেম, ২০০১ : ২৪০)

একটি রাষ্ট্রের ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে রাজনীতির গভীর সম্পর্ক বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর ছিল সুস্পষ্ট এবং অর্থবহ ধারণা। যে-কোনো সদর্থক ভাষা ও সাহিত্য আন্দোলনকে তিনি বিবেচনা করেছেন মূল রাজনৈতিক দর্শনচিন্তার আলোকে। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায় ১৯৭১ সালের ২৪শে জানুয়ারি পূর্ব-পাকিস্তান সংগীত শিল্পী সমাজ আয়োজিত তাঁর ভাষণ। ওই ভাষণে তিনি বলেছেন : 'একটি জাতিকে পঙ্গু ও পদানত করে রাখার সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা তার ভাষা ও সংস্কৃতিকে বিনষ্ট করা। বাংলার মানুষ মুসলমান নয়, তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি নেই —এই ধরনের অভিযোগ দিয়ে বাঙালির বিরুদ্ধে ২৩ বছর ধরে তাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি বিনষ্ট করার ষড়যন্ত্র চলছে। আর বাংলার মানুষও এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বিরামহীন সংগ্রাম চালিয়ে আসছে। '৫২ সালের ভাষা আন্দোলন শুধু বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি আদায়ের আন্দোলন ছিল না, এই আন্দোলন ছিল বাংলার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তির আন্দোলন (দ্রষ্টব্য : এ কে আব্দুল মোমেন, ২০২০ : ২২৯)।

স্বাধীনতার পর অতি অল্প সময়ে বাংলা ভাষায় সংবিধান রচনা করার ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পালন করেছেন ঐতিহাসিক ভূমিকা। আদালতের রায় বাংলা ভাষায় লেখার

নির্দেশ দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু। যথাযথ পরিভাষা না থাকার কারণে রাষ্ট্রের সর্বত্র বাংলা ভাষা ব্যবহারে সমস্যা দেখা দিতে পারে– একথা অনুধাবন করে ১৯৭১ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমি আয়োজিত সভায় বঙ্গবন্ধু বলেন : 'আমি ঘোষণা করছি, আমাদের হাতে যেদিন ক্ষমতা আসবে, সেদিন থেকেই দেশের সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু হবে। বাংলা ভাষার পণ্ডিতেরা পরিভাষা তৈরি করবেন, তারপর বাংলা ভাষা চালু হবে, সে হবে না। পরিভাষাবিদেরা যত খুশি গবেষণা করুন, আমরা ক্ষমতা নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষা চালু করে দেব, সে বাংলা যদি ভুল হয়, তবে ভুলই চালু হবে, পরে তা সংশোধন করা হবে' (*দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৬.০২.১৯৭১)। রাষ্ট্রের সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলনে বঙ্গবন্ধু যে কত আন্তরিক ছিলেন, ওপরের ভাষ্য থেকে তা সম্যক উপলব্ধি করা যায়। সর্বস্তরে বাংলা প্রচলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন আন্তরিক। স্বাধীন রাষ্ট্রের মাতৃভাষা বাংলা ব্যবহারে সরকারি-বেসরকারি দপ্তরে অনীহা লক্ষ করে বঙ্গবন্ধু একই সঙ্গে ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ হন। ১৯৭২ সালের ২৫শে এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রের সর্বস্তরে বাংলা ভাষা ব্যবহারের জন্য একটি সরকারি নির্দেশ জারি করেন (মুনতাসীর মামুন, ২০১২ : ৩৩৩)। দাপ্তরিক কাজে বাংলা ভাষা ব্যবহারের সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও ইংরেজি ভাষায় নথিপত্র লেখার কারণে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সতর্ক করে বঙ্গবন্ধু জারি করেন এই নির্দেশ। কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্য করে বঙ্গবন্ধু লেখেন : 'আমি কিছুদিন যাবৎ দুঃখের সাথে লক্ষ করছি যে, আমাদের উপর্যুপরি সিদ্ধান্ত এবং ঘোষণা সত্ত্বেও বিভিন্ন সরকারী, আধা সরকারী, অন্যান্য দপ্তর ও প্রতিষ্ঠানে এখনো বাংলা ভাষা ব্যবহার হচ্ছে না। উপরন্তু বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে, দপ্তর ও সরকারী প্রতিষ্ঠানে পূর্বতন ইংরেজি ভাষা ব্যবহারের দিকে প্রবণতা রয়েছে। ... এখন থেকে আমার নির্দেশ রইল যে, সর্বস্তরে সকল দপ্তরে ও প্রতিষ্ঠানে বাংলা ভাষা ব্যবহার করতে হবে' (উদ্ধৃত : মুনতাসীর মামুন, ২০১২ : ৩৩৩)

বঙ্গবন্ধুর উপর্যুক্ত নির্দেশনা জারির ফলে রাষ্ট্রের সর্বস্তরে বাংলা ভাষা ব্যবহৃত হতে আরম্ভ হয়। সরকারি-বেসরকারি দপ্তর থেকে ইংরেজি নামফলক সরিয়ে বাংলা নামফলক লাগানো হয়, বিভিন্ন দপ্তরে বাংলায় নথিপত্র লেখা চালু হয়। ২২টি পরিভাষা কমিটির মাধ্যমে বাংলা উন্নয়ন বোর্ড কমবেশি ৮০ হাজারের মতো পারিভাষিক শব্দ সংগ্রহ করে। সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন দপ্তরে বাংলা টাইপরাইটার, বাংলা শর্টহ্যান্ড এবং বাংলা টেলিপ্রিন্টার চালু হয়। শুধু তাই নয়, বঙ্গবন্ধুর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সরকারি কর্মকমিশনসহ উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে বাংলা ভাষার ব্যবহার বৃদ্ধি পেতে থাকে (এম আবদুল আলীম, ২০২০ : ২৬৭)। সরকারি কাজে বাংলা ভাষা যাতে সুষ্ঠুভাবে ব্যবহৃত হয় সে-লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে 'সরকারি পর্যায়ে বাংলা প্রচলন কমিটি' নামে একটি কমিটি গঠন করেন। ১৯৭৩ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারি *দৈনিক বাংলা* পত্রিকায় এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্টে বলা হয় : 'বঙ্গবন্ধু সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, অফিসের নথি ও অন্যান্য কাগজপত্র বাংলায় না লেখা হলে তাঁর কাছে উপস্থাপিত করা যাবে না। সুতরাং যাবতীয় সরকারি নথিপত্রাদি বাংলায় লেখার জন্য কেবিনেট ডিভিশন এক পরিপত্রে সকল মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানিয়েছে। আরও জানা গেছে যে, বঙ্গবন্ধু সরকারি কাগজপত্রে বাংলা ভাষা ব্যবহার করার জন্য কয়েকটি নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও সরকারি নথিপত্র, ফরম ইত্যাদিতে পুরোপুরি বাংলা ব্যবহারের বাস্তব উদ্যোগ নেয়া হয়নি বলে উক্ত পরিপত্রে অভিযোগ করা হয়েছে (*দৈনিক বাংলা*, ১৯.০২.১৯৭৩)। ১৯৭৫ সালের ১২ই মার্চ

রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সরকারি কাজে বাংলা ভাষা প্রচলনের নির্দেশ জারি করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাক্ষরিত সরকারি নির্দেশটি ছিল নিম্নরূপ :

রাষ্ট্রপতির সচিবালয়
গণভবন, ঢাকা
তারিখ : ১২ই মার্চ ১৯৭৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রভাষা বাংলা। বাংলা আমাদের জাতীয় ভাষা। তবুও অত্যন্ত দুঃখের সাথে লক্ষ্য করছি যে, স্বাধীনতার তিন বৎসর পরেও অধিকাংশ অফিস-আদালতে মাতৃভাষার পরিবর্তে বিজাতীয় ইংরেজি ভাষায় নথিপত্র লেখা হচ্ছে। মাতৃভাষার প্রতি যাঁর ভালবাসা নেই দেশের প্রতি যে তাঁর ভালবাসা আছে এ কথা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। দীর্ঘ তিন বৎসর অপেক্ষার পরও বাংলাদেশের বাঙালী কর্মচারীরা ইংরেজী ভাষায় নথিতে লিখবেন সেটা অসহনীয়। এ সম্পর্কে আমার পূর্ববর্তী নির্দেশ সত্ত্বেও এ ধরনের অনিয়ম চলছে। আর এ উশৃংখলতা চলতে দেয়া যেতে পারে না।

এ আদেশ জারী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সকল সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ও আধা সরকারী অফিসসমূহে কেবলমাত্র বাংলার মাধ্যমে নথিপত্র ও চিঠিপত্র লেখা হবে। এ বিষয়ে কোন অন্যথা হলে উক্ত বিধি লংঘনকারীকে আইনানুগ শাস্তি দেবার ব্যবস্থা করা হবে। বিভিন্ন অফিস-আদালতের কর্তাব্যক্তিগণ সতর্কতার সাথে এ আদেশ কার্যকরী করবেন এবং আদেশ লংঘনকারীদের বিরুদ্ধে শাস্তির বিধানের ব্যবস্থা করবেন। তবে বিদেশী সংস্থা বা সরকারের সাথে পত্রযোগাযোগ করার সময় বাংলার সাথে সাথে ইংরেজী কিংবা সংশ্লিষ্ট ভাষায় একটি প্রতিলিপি পাঠানো প্রয়োজন। তেমনিভাবে বিদেশের কোন সরকার বা সংস্থার সাথে চুক্তি সম্পাদনের সময় বাংলার সাথে সাথে অনুবাদিত ইংরেজি বা সংশ্লিষ্ট ভাষায় প্রতিলিপি ব্যবহার করা চলবে।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

(উদ্ধৃত : রতনলাল চক্রবর্তী, ২০০০ : ৩৭৫–৩৭৬)

লক্ষণীয়, স্বল্প-পরিসরের মধ্যেই বঙ্গবন্ধু সর্বস্তরে বাংলা ভাষা ব্যবহারের যে নির্দেশ দিয়েছেন, এককথায় তা ছিল ঐতিহাসিক এক সিদ্ধান্ত। বিদেশে পত্রযোগাযোগে তিনি বাংলাকে প্রাধান্য দিয়েছেন, সঙ্গে থাকবে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক ভাষায় প্রতিলিপি। এ এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত। বঙ্গবন্ধুর এ নির্দেশ কখনো পালিত হয়েছে কি-না, আমাদের জানা নেই।

কেবল মাতৃভাষা বাংলা নয়, বাংলা সাহিত্যের প্রতিও ছিল বঙ্গবন্ধুর গভীর অনুরাগ। বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা অবলীলায় উচ্চারণ করতেন। ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের দিনে বঙ্গবন্ধু রেসকোর্স ময়দানে যে ভাষণ দেন, সেখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বঙ্গমাতা' কবিতার কথা উল্লেখ করেন। ১৯৭১ সালের ৩রা জানুয়ারি রেসকোর্স ময়দানে আয়োজিত বাংলাদেশ ছাত্রলীগের ২৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিক উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে প্রদত্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন : 'কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল ইসলামকে উপেক্ষা করিয়া বাংলা সাহিত্যের কথা চিন্তা করাও পাপ। অথচ এ দেশে রবীন্দ্রনাথকে অপাঙ্‌ক্তেয় ও নজরুল-সাহিত্যকে 'মুসলমানী' করার নামে বিকৃত করার চেষ্টা হইয়াছে। আমাদের বাংলা ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ওপর বার বার আঘাত আসিয়াছে' (উদ্ধৃত : সেলিনা হোসেন, ২০২০ : ৪৮)। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে দেখা করার জন্য শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫২ সালে যখন পশ্চিম পাকিস্তান যান, তখন গাড়িতে করে একদিন হায়দ্রাবাদ

থেকে শেখ মুজিবুর রহমান ও কয়েকজন পাকিস্তানি আইনজীবীসহ করাচি ফিরছিলেন সোহরাওয়ার্দী। পথিমধ্যে পাকিস্তানি আইনজীবীরা শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে নানা প্রশ্ন করেন। শেখ মুজিবুর রহমান *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*তে প্রসঙ্গটির স্মৃতিচারণ করেছেন এভাবে :

> বিকালে করাচি রওয়ানা করলাম, শহীদ সাহেব নিজে গাড়ি চালালেন– আমি তাঁর পাশেই বসলাম। পিছনে আরও কয়েকজন এডভোকেট বসলেন। রাস্তায় এডভোকেট সাহেবরা আমাকে পূর্ব বাংলার অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করলেন। বাংলা ভাষাকে কেন আমরা রাষ্ট্রভাষা করতে চাই? হিন্দুরা এই আন্দোলন করছে কি না? আমি তাঁদের বুঝাতে চেষ্টা করলাম। শহীদ সাহেবও তাঁদের বুঝিয়ে বললেন এবং হিন্দুদের কথা যে সরকার বলছে, এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা তা তিনিই তাদের ভাল করে বুঝিয়ে দিলেন। আমার কাছে তাঁরা নজরুল ইসলামের কবিতা শুনতে চাইলেন। আমি তাঁদের 'কে বলে তোমায় ডাকাত বন্ধু', 'নারী', 'সাম্য'– আরও কয়েকটা কবিতার কিছু কিছু অংশ শুনালাম। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কবিতাও দু'একটার কয়েক লাইন শুনালাম। শহীদ সাহেব তাঁদের ইংরেজি করে বুঝিয়ে দিলেন। কবিগুরুর কবিতার ইংরেজি তরজমা দু'একজন পড়েছেন বললেন। আমাদের সময় কেটে গেল। (শেখ মুজিবুর রহমান, ২০১২ : ২১৭)

সাহিত্য-শিল্পের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গণমানুষের উন্নতির কথা ভেবেছেন– সাহিত্যিককে সাধারণ মানুষের কাতারে নেমে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। বঙ্গবন্ধু মনে করেন– জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোনোদিনই মহৎ সাহিত্য রচিত হতে পারে না। কেবল শহর নয়, গ্রামীণ জীবন ও জনপদকেও সাহিত্যের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলার কথা বলেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধু বিশ্বাস করতেন– সাহিত্য-শিল্পকলার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের জীবনসংগ্রামের প্রতিরূপ নির্মাণই লেখকের মুখ্য কাজ। সাহিত্যের রসসৃষ্টির কথা মনে রেখেও তিনি সাহিত্যের সামাজিক উপযোগিতার কথাটাকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেছেন। ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলা একাডেমি আয়োজিত প্রথম আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাহিত্য প্রসঙ্গে যে কথা বলেছেন, তা তাঁর প্রাতিস্বিক সাহিত্যভাবনারই শিল্পিত ও স্ফটিকসংহত ভাষ্য। বঙ্গবন্ধুর সাহিত্যভানার স্বরূপ উপলব্ধির জন্য তাঁর সেদিনের বক্তৃতার অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রাসঙ্গিক অংশ আমরা নিচে উদ্ধৃত করছি :

> অমর একুশের কথা ভাবতে গেলেই আমার মনে অনেক স্মৃতি এসে ভিড় জমায়। যে বাংলা একাডেমির প্রাঙ্গণে আপনারা সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন করছেন, সেই বাংলা একাডেমি এদেশের দুর্জয় জনতার মাতৃভাষার সংগ্রামে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের জ্বলন্ত সাক্ষ্য বহন করছে। বাংলা ভাষার দাবিতে আমাদের আন্দোলন শুরু হয় ১৯৪৮ সালে ১১ই মার্চ। সেদিনের স্বৈরাচারী সরকার আমাদের মাতৃভাষার দাবিকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য নির্মম নির্যাতনের আশ্রয় নিয়েছিল। কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ এবং লাঠিচার্জে আহত হয়েছিল শত শত ছাত্র-জনতা। ঐদিন সকালেই বিক্ষোভ-মিছিল থেকে অন্যান্য সহকর্মীর সাথে আমাকেও গ্রেফতার করা হয়। শুরু হয় নির্যাতন ও কারাযন্ত্রণা। কিন্তু কোনো শক্তিই কখনো সত্যের পথ থেকে আমাকে নিবৃত্ত করতে পারে নাই। যাই হোক, তারপর এলো বায়ান্নর সেই রক্তাক্ত ফাল্গুন। তখন আমি জেলখানায়। জেল থেকে চিকিৎসার জন্য আমাকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে মানিক মিয়া নামক জনৈক পুলিশ সাব-ইনস্পেক্টরের সাহায্যে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের সকলের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করি। আমার সঙ্গে পরামর্শ করেই তাঁরা ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্দোলনের

সিদ্ধান্ত নেন। এবং তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করেই আমি ১৬ই ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু করি অনশন ধর্মঘট। সেই অনশন ধর্মঘট আমি চালিয়ে যাই ২৭শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। আমার সেদিনের বন্ধুরা হয়ত সেটা আজও মনে করতে পারবেন। আমাদের সেদিনের সেই আন্দোলন জয়যুক্ত হয়েছিল। একুশের রক্তরাঙা পথ বেয়েই বাঙালির জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং স্বাধিকার চেতনা ধীরে ধীরে এক দুর্বার গতি লাভ করে।

স্বাধীনতার পর বাংলা একাডেমির উদ্যোগে আমার দেশের শিল্পী-সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিসেবীরা এই প্রথম একটি জাতীয় সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন করেছেন। এই মহতী প্রচেষ্টা যে খুবই সময়োপযোগী হয়েছে, তা বলাই বাহুল্য। দীর্ঘকালব্যাপী নানা শোষণ এবং বঞ্চনার ফলে অর্থনৈতিক দিক থেকে আজ আমরা দরিদ্র, ক্ষুধার্ত ও নানা সমস্যায় জর্জরিত। এই অবস্থা কাটিয়ে ওঠার জন্যও আজ আমরা অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রামে এবং দেশ গড়ার কাজে লিপ্ত রয়েছি। কিন্তু আমরা সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের দিক থেকে দরিদ্র নই। আমাদের ভাষার দু'হাজার বছরের একটি গৌরবময় ইতিহাস আছে। আমাদের সাহিত্যের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ। আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর। আজকে স্বাধীন জাতি হিসেবে বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হলে আমাদের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের মর্যাদাকে দেশে ও বিদেশে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

আমি জানি আমাদের মুক্তি আন্দোলনের প্রতিটি পর্যায়ে রাজনৈতিক কর্মী, মেহনতি মানুষ, কৃষক-শ্রমিক এবং ছাত্র-তরুণদের পাশাপাশি দেশের শিল্পী-সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিসেবীরাও সক্রিয়ভাবে যোগ দিয়েছেন, নির্যাতন সহ্য করেছেন, রক্ত দিয়েছেন। বিশ্বের স্বাধীনতালব্ধ জাতিগুলির মধ্যে আমরা এদিক থেকে গর্ব করতে পারি যে, আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগ্রাম হাতে হাত ধরে অগ্রসর হয়েছে। আজকে যখন দেশ স্বাধীন হয়েছে, তখন সাহিত্যিক, শিল্পী ও সংস্কৃতিসেবীদের কাছে আমার প্রত্যাশা আরো অধিক। যাঁরা সাহিত্য সাধনা করছেন, শিল্পের চর্চা করছে, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সেবা করছেন, তাঁদেরকে দেশের জনগণের চিন্তা-ভাবনা, আনন্দ-বেদনা এবং সামগ্রিক তথ্যে তাঁদের জীবন-প্রবাহ আমাদের সাহিত্যে ও শিল্পে অবশ্যই ফুটিয়ে তুলতে হবে। সাহিত্য শিল্পে ফুটিয়ে তুলতে হবে এদেশের দুঃখী মানুষের আনন্দ-বেদনার কথা। সাহিত্য-শিল্পকে কাজে লাগাতে হবে তাঁদের কল্যাণে। আজ আমাদের সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে দুর্নীতির শাখা-প্রশাখা বিস্তার করেছে, আপনাদের লেখনীর মাধ্যমে তার মুখোশ তুলে ধরুন; দুর্নীতির মূলোচ্ছেদে সরকারকে সাহায্য করুন। আমি সাহিত্যিক নই, শিল্পী নই, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে, জনগণই সব সাহিত্য ও শিল্পের উৎস। জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোনোদিন কোনো মহৎ সাহিত্য বা উন্নত শিল্পকর্ম সৃষ্টি হতে পারে না। আমি সারাজীবন জনগণকে সাথে নিয়েই সংগ্রাম করেছি, এখনো করছি, ভবিষ্যতেও যা কিছু করব, জনগণকে নিয়েই করব।...

আপনাদের কাছে আমার আবেদন, আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি যেন শুধু শহরের পাকা দালানেই আবদ্ধ না হয়ে থাকে, বাংলাদেশের গ্রাম-গ্রামান্তরের কোটি কোটি মানুষের প্রাণের স্পন্দনও যেন তাতে প্রতিফলিত হয়। আজকের সাহিত্য সম্মেলনে যদি এ-সবের সঠিক মূল্যায়ন হয়, তবে আমি সবচেয়ে বেশি আনন্দিত হব।

যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশে আজ সমস্যার অন্ত নেই। আমাদের আর্থিক অনটন আছে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুঃসহ অভাব আছে, কিন্তু আমি মনে করি, সবকিছুর ঊর্ধ্বে আমাদের মূল্যবোধের অভাবই আজ সবচেয়ে পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছে। এই অভাব জাতীয় জীবনে যে সংকটের সৃষ্টি করছে তা অবিলম্বে রোধ করা দরকার। আমি বিশ্বাস করি, দেশের সাহিত্যিক, শিল্পী, সংস্কৃতিসেবী, শিক্ষাব্রতী ও বুদ্ধিজীবীরা এই সংকট উত্তরণে এবং জাতীয় মূল্যবোধের উজ্জীবনে ও সুকুমারবৃত্তির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। আজকে সময়

এসেছে, যখন প্রত্যেককে আত্ম-বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে, নিজের নিজের ক্ষেত্রে তাঁরা দেশের কল্যাণে সেই দায়িত্ব ও ভূমিকা কতটা আন্তরিকভাবে পালন করছেন। দেশ ও জাতি আজ তাঁদের নিকট এই দাবি জানায়। একটি সুষ্ঠু জাতি গঠনে শিল্প, কৃষি, যোগাযোগ ব্যবস্থা বা অন্যান্য সর্বক্ষেত্রে যেমন উন্নয়ন প্রয়োজন, তেমনই প্রয়োজন চিন্তা ও চেতনার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করা। আমি সর্বত্রই একটি কথা বলি সোনার বাংলা গড়তে হলে সোনার মানুষ চাই। সোনার মানুষ আকাশ থেকে পড়বে না, মাটি থেকেও গজাবে না। এই বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের মধ্য থেকে তাঁদেরকে সৃষ্টি করতে হবে। নবতর চিন্তা, চেতনা ও মূল্যবোধের প্রকৌশলী দেশের সুধী সাহিত্যিক, শিল্পী, শিক্ষাব্রতী, বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতিসেবী। আমি আজকের এই সাহিত্য সম্মেলনে আপনাদেরকে সোনার মানুষ সৃষ্টির কাজে আত্মনিয়োগ করার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি। এই সম্মেলনে বন্ধু রাষ্ট্রসমূহ থেকে অতিথি হিসেবে যাঁরা যোগ দিয়েছেন এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যাঁরা এখানে সমবেত হয়েছেন, তাঁদের সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমি এই সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে আনুষ্ঠানিকভাবে এই সম্মেলন উদ্বোধন করছি।

জয় বাংলা।

(উত্তরাধিকার, ২০১৫ : ৯২–৯৬)

পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসকরা বাঙালির সদর্থক সংস্কৃতিচর্চার ক্ষেত্রে পদে-পদে বাধার সৃষ্টি করেছে। পাকিস্তানি প্রচার মাধ্যমে রবীন্দ্রসংগীত বর্জনের সিদ্ধান্ত এমনি একটা বাধার উদাহরণ। কিন্তু বাঙালি জনগোষ্ঠী ঔপনিবেশিক শাসকদের এই হীন ষড়যন্ত্র মেনে নেয়নি, মেনে নেননি বঙ্গবন্ধুও। ১৯৬৯ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে মুক্ত হয়ে পরের দিন সোহরাওয়ার্দী ময়দানে দেওয়া সংবর্ধনা সভায় বাঙালি সংস্কৃতি সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু যে-কথা বলেন, বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতি তা তাঁর ভালোবাসার উজ্জ্বল স্মারক। ওই সংবর্ধনা সভায় বঙ্গবন্ধু বলেন : 'আমরা মীর্জা গালিব, সক্রেটিস, শেকসপীয়র, এরিস্টটল, দান্তে, লেনিন, মাও-সে-তুং পড়ি জ্ঞান আহরণের জন্য। আর দেউলিয়া সরকার আমাদের পাঠ নিষিদ্ধ করে দিয়েছে রবীন্দ্রনাথের লেখা, যিনি একজন বাঙালি কবি এবং বাংলায় কবিতা লিখে যিনি বিশ্বকবি হয়েছেন। আমরা রবীন্দ্রনাথের বই পড়বই, আমরা রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইবই এবং রবীন্দ্রসঙ্গীত এই দেশে গীত হবেই' (উদ্ধৃত : মুনতাসীর মামুন, ২০১২ : ২৯৬)। ১৯৬৬ সালে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনের উদ্বোধনী সংগীত হিসেবে গীত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটি। সেদিন শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন ভবিষ্যতে রবীন্দ্রনাথের এই গানটিই হবে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত। উত্তরকালে, স্বাধীনতার পর, রবীন্দ্রনাথের 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটিকে বঙ্গবন্ধু নির্বাচন করেছিলেন বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হিসেবে। অন্যদিকে, বাংলাদেশের রণসংগীত হিসেবে তিনি নির্বাচন করেছিলেন কাজী নজরুল ইসলামের 'চল্ চল্ চল্ ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল' গানটি।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মর্মে-মর্মে রাজনীতির মানুষ হয়েও ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পর্কে যেসব কথা বলেছেন, তা ভাবলে রীতিমতো বিস্মিত হতে হয়। তিনি যথার্থই ছিলেন রাজনীতির কবি– Poet of politics। মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য মধ্যবিত্তের শাহরিক ভাষার পরিবর্তে তিনি লোকভাষা ব্যবহারে ছিলেন অধিক উৎসাহী। তাঁর লেখা ও বক্তৃতায় লোকভাষা-আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারের বিস্ময়কর সার্থকতা লক্ষ করা যায়। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের কথা আমরা এ প্রসঙ্গে স্মরণ করতে পারি। বঙ্গবন্ধু শোষণমুক্ত ও

গণতান্ত্রিক অসাম্প্রদায়িক মানবিক বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছেন– তাঁর ভাষা ও সাহিত্যচিন্তা সে-স্বপ্নেরই সমার্থক এক অনুষঙ্গ।

সহায়কপঞ্জি

আতিউর রহমান (প্রকাশকাল অনুক্ত)। 'বঙ্গবন্ধুর নান্দনিক ভাবনা'। ঢাকা।

আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (২০১৮)। 'বঙ্গবন্ধুর বাংলাভাষা ও সংস্কৃতি-ভাবনা'। ঢাকা : গোবিন্দ দেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

আবুল কাসেম *সম্পা.* (২০২০)। *শেখ মুজিবুর রহমান : ভাষণসমগ্র (১৯৫৫-১৯৭৫)*। ঢাকা : চারুলিপি।

এম আবদুল আলীম (২০২০)। *বঙ্গবন্ধু ও ভাষা-আন্দোলন*। ঢাকা : বাংলা একাডেমি।

এম আর মাহবুব (২০১৩)। *রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান*। ঢাকা : অনিন্দ্য প্রকাশ।

তোফায়েল আহমেদ (২০১২)। 'জাতির জনকের মহৎ কণ্ঠ'। *দৈনিক প্রথম আলো*। ঢাকা ২৫.০৯.২০১২।

বিশ্বজিৎ ঘোষ (২০০৯)। *বাংলাদেশের সাহিত্য*। ঢাকা : আজকাল প্রকাশনী।

মুনতাসীর মামুন *সম্পা.* (২০১২)। *বঙ্গবন্ধুর ভাষণ*। ঢাকা : চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর।

রতন লাল চক্রবর্তী *সম্পা.* (২০০০)। *ভাষা আন্দোলনের দলিলপত্র*। ঢাকা : বাংলা একাডেমি।

শেখ মুজিবুর রহমান (২০১২)। *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*। ঢাকা : দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।

শেখ মুজিবুর রহমান (২০১৭)। *কারাগারের রোজনামচা*। ঢাকা : বাংলা একাডেমি।

খে মুজিবুর রহমান (২০২০)। *আমার দেখা নয়াচীন*। ঢাকা : বাংলা একাডেমি।

সন্তোষ গুপ্ত (২০০০)। 'বিশ্বদরবারে বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধুর অবদান'। ঢাকা : *দৈনিক সংবাদ*, ২১.০২.২০০০।

সেলিনা হোসেন (২০০০)। *পূর্ববঙ্গ থেকে বাংলাদেশ "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শেখ মুজিব*। ঢাকা : কথা প্রকাশ।

Shahryar Iqbal *edit.* (1977). *Sheikh Mujib in Parliament (1955-58)*. Dhaka : Agamee Prokashani.

Sheikh Hasina (2019). *Secret Documents of Intelligence Brach on Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman*, Vol. 3, Dhaka : Hakkani Publishers.

উত্তরাধিকার, নবপর্যায়ে ৫৯তম সংখ্যা, মে ২০১৫, ঢাকা : বাংলা একাডেমি।

দৈনিক ইত্তেফাক, ২৫.০৫.১৯৬৪, ১৩.০২.১৯৭১, ১৬.০২.১৯৭১, ০৮.১২.১৯৯৯

দৈনিক বাংলা, ১৯.০২.১৯৭৩

দৈনিক সংবাদ, ২১.০২.২০০০